ফেরা

সমকালীন প্রকাশন

ফেরা ২

রাত্রির শেষ প্রহর। সাত আসমানের অধিপতি নেমে এসেছেন প্রথম আসমানে। বান্দাদের ডাকছেন—

আছে কি কোনো তাওবাকারী, যার তাওবা আমি কবুল করব?

আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী, যাকে আমি ক্ষমা করে দেবো?

কেউ কি কিছু চাইছে আমার কাছে, যাকে আমি দান করব?

ঠিক এই সময়, একদম এই সময়েই আলো জ্বলে ওঠে বিন্নুরি গার্লস মাদরাসার ২০৩ নম্বর কক্ষে।

'মারইয়াম, উঠে পড়ো! তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। আনুশিয়া, রুকাইয়া ওঠো! তাহাজ্জুদ পড়বে না?'

যে মেয়েটা একে একে সবাইকে ডাকছে তার নাম আয়িশা। নওমুসলিম সে। দিন পনেরো হলো মাদরাসায় এসেছে। সঙ্গে এসেছে তার ছোট বোন মারইয়াম।

রাত্রির শেষ প্রহরে নিয়ম করে ঘুম ভেঙে যায় আয়িশার। দু-চারটা সুরা মুখস্থ হয়েছে সবে। ওটুকু সম্বল করেই আবেগমথিত হৃদয়ে রবের সামনে দাঁড়ায় সে। পার্থিব কোলাহলকে পেছনে ফেলে সে মগ্ন থাকে নিবিড় আলাপনে, সুমহান রবের সাথে।

কেমন করে এ জীবনে এলো আয়িশা? কেনই-বা মারইয়াম তার সঙ্গী হলো? তাদের তো জন্ম হয়েছিল এক হিন্দু পরিবারে। তারা তো বেড়ে উঠেছিল এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজে—এমন এক সমাজে, যেখানে সব ধর্মের অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার। মুসলিমরা হোলি খেলছে, সাড়ম্বরে অংশ নিচ্ছে বসন্তপূজায়। হিন্দুরাও অভ্যস্ত মুসলিমদের জীবনাচারে। অজ্ঞতা আর মূর্খতায় ঘেরা জীবন। কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছে, কীসের পিছনে ছুটছে সবাই!

তবুও তো এমন হয়—প্রচণ্ড ঝড়ে লণ্ডভণ্ড অস্থির প্রকৃতিতে প্রাণের জোয়ার আসে। জ্বলে ওঠে জীবনের প্রদীপ। দমকা বাতাসও সে প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে না। এমনই দুটি প্রদীপের নাম আয়িশা আর মারইয়াম। কী করে জ্বলে উঠল তারা? শোনা যাক আয়িশার জবানিতে।

আমাদের পরিবার

'বাবা মুসলিম, মা হিন্দু আর মেয়ে হয়েছে আধা খ্রিস্টান—তামাশার শেষ নেই সংসারে!'

মায়ের চিৎকার আমাদের রুম থেকেও দিব্যি শোনা যাচ্ছে। নীলমের সাথে চোখাচোখি হলো আমার। ইশারায় বলে দিলাম রুমের দরজাটা যেন লাগিয়ে দেয়। তাতে যদি আওয়াজ কিছুটা কমে! খুব একটা লাভ হয়নি অবশ্য। প্রতি রাতে নিয়ম করে মায়ের আহাজারি শুরু হয়। রাত যত বাড়ে, তার চিৎকারও বাড়ে। খাবার টেবিল গুছাতে গুছাতে মা একবার না একবার এসব কথা তুলবেনই। বাবার অসহায় ম্রিয়মাণ গলা ঢাকা পড়ে যায় বাসন-কোসনের ঝনঝনানিতে।

মায়ের চ্যাঁচামেচির কোনো সমাধান নেই আসলে। মনের ঝাল মেটাতে সুযোগ পেলেই তিনি চিৎকার করেন। বাবা তার মুসলিম কর্মচারীর পাল্লায় পড়েছেন। ভদ্রলোক ভীষণ ধার্মিক, সজ্জন ব্যক্তি। দাড়ি আছে, ধর্মকর্ম করেন বেশ নিষ্ঠার সাথে। সম্প্রতি বাবাকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে বসেছেন। এখানেই ব্যাপারটা শেষ হলে চিন্তার কিছু ছিল না। চিন্তার বিষয় হলো বাবা তার দাওয়াত কবুল করে নিয়েছেন।

আমাদের পরিবারে, মায়ের ভাষায় 'তামাশার সংসারে' এমন খবরটা সহজভাবে নেওয়ার অবকাশ নেই। মা আমার মনেপ্রাণে হিন্দু। স্বামী মুসলিম হয়ে যাবেন—এটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। যদিও আমরা থাকি মিশ্র এক পরিবেশে, তবুও। মিলেমিশে সব ধর্মের রীতিনীতি এক-আধটু পালন করা আর একেবারে ধর্মান্তরিত

হয়ে যাওয়াতে তফাত আছে। আত্মীয়-স্বজন মানবে না, সমাজও একঘরে করে দেবে। আর আমার মা-ও এই তফাত মানতে পারছেন না কোনোভাবেই। এজন্যই রোজ রোজ হট্টগোল।

আমাদের বর্তমান নিবাস মিরপুরখাস জেলার এক ভাড়া বাড়িতে। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একদম সীমান্তঘেঁষা জেলা এই মিরপুরখাস। সীমান্তবর্তী বলেই এখানে হিন্দু-মুসলিমের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। ধর্ম নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা নেই এখানকার মানুষের। এক ধর্মের লোকেরা আরেক ধর্মের প্রথা দিব্যি মেনে চলেছে। মুসলিমরা রাখি বন্ধনের অনুষ্ঠান করছে তো হিন্দুরা ঝাড়-ফুঁকের জন্য দৌড়াচ্ছে মসজিদে। আমার বড় দুই ভাইয়ের কথাই ধরা যাক। তারা রামাদানে সিয়াম রাখে, সাহরি খায়। ফজরের সালাত আদায় করে। অন্য চার ওয়াক্ত সালাতেও তাদের দেখা যায় কদাচিৎ। তাদের কথা, 'হিন্দু বলো আর মুসলিম, আমাদের সবার প্রভু তো একজনই।'

বাবা আগে রাগ করতেন ভাইদের সালাত পড়তে দেখলে। এখন তিনি নিজেই মুসলিম হয়ে যেতে চাইছেন। অবশ্য মায়ের চ্যাঁচামেচিতে তার মুসলিম হবার খায়েশ ইতোমধ্যে ধামাচাপা পড়ে গেছে। ধামাচাপা পড়ে গেছে মেজো দিদির খ্রিস্টান হবার শখও। কীজন্য সে খ্রিস্টধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল ঠিক মনে নেই। তবে মা-বাবা তা হতে দেননি। মেজো দিদি লক্ষ্মীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন তড়িঘড়ি করে।

আমরা সাত ভাই-বোন। বড় দিদি আর মেজো দিদি থাকে যার যার শ্বশুরবাড়িতে। বড় দুই ভাইয়ের ছোটখাটো যৌথ ব্যবসা আছে। ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত তারা। বাবার মতোই দশ-পনেরো দিন পরপর বাড়ি আসে। ভাইদের পর আমি, আমার ছোটবোন নীলম আর সবচে ছোট এক ভাই।

বড় ভাইদের মতো বাবারও নিজস্ব ব্যবসা। মিরপুরখাসে আসার আগে আমরা থাকতাম পাশের জেলা সংহারে। বাবার ব্যবসায় লোকসান হলো, তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমরা পাড়ি জমালাম মিরপুরখাসে। দুই জেলার সংস্কৃতিতে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। তাই মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি তেমন। মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতি এখানে। যার ছাপ আমাদের পরিবারেও বেশ ভালোমতোই পড়েছে—মা ধর্মপ্রাণ হিন্দু, বাবা আর দিদি মায়ের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে হিন্দুধর্মে, আর ভাইয়েরা নিজেদের মতো করে কখনো ইসলাম, কখনো হিন্দুধর্মের রীতিতে গা ভাসাচ্ছে।

এসময়টা আমার মনে হতো পরিবারে মা বাদে বাকিরা বুঝি ইসলামের ব্যাপারে বেশ সহনশীল। সময়ের সাথে সাথে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সবার অনুরাগ ফিকে হয়ে আসতে দেখলাম নিজ চোখে। আর ইসলামকে ভালোবেসে ফেললাম আমি—যার কিনা ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না বললেই চলে। জানি না কোন সময়ে আমার হৃদয়ে ঈমানের ফুল ফুটেছিল।

শুরু হলো নতুন জীবন। নিস্তরঙ্গ, নির্বিবাদী জীবন ফেলে ঝাঁপ দিলাম এক অজানা গন্তব্যে। আমার সঙ্গী হলো নীলম। মনিকা থেকে আমি হলাম আয়িশা আর নীলম হলো মারইয়াম।

নিরাপত্তার বলয়ে

মেট্রিক পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা বেশ সাদামাটা ছিল। বাবা-মা যে ধর্ম মানেন, আমরাও সেই ধর্ম মেনে চলি। সেই ধর্ম আসলে কতটা যৌক্তিক? সেটা কি সত্য ধর্ম, না মিথ্যা ধর্ম—এসব বিষয় তখনো আমাদের চিন্তায় আসেনি। আমরা তখন ভাবতাম, আমাদের বড়রা হিন্দু; তাই আমরাও হিন্দু। সহজ কথায়, ধর্মের ব্যাপারে তখনো আমরা ছিলাম খুবই সীমাবদ্ধ চিন্তার মানুষ। তবে এই সীমাবদ্ধতার মাঝেও কেন জানি পর্দা করতাম আমি। মাথা ঢেকে রাখতাম মুসলিম মেয়েদের মতো। এর মধ্যে অন্যরকম স্বস্তি আর নিরাপত্তা অনুভব করতাম, পর্দাকে মনে করতাম নিজের সম্ভ্রম আর শালীনতার অংশ।

কেন আমি হিন্দু হয়েও পর্দার বিধানকে এত আপন করে নিয়েছিলাম? এখন মনে হয়, আমি তখন এক পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম। সেখানে সূর্যের আলো আসা বারণ। একদিন পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্যের আলো এসে পৌঁছল, জেগে উঠল আমার সমগ্র সত্তা। পর্দা ছিল সে আলোর প্রথম কিরণ।

ঘরের লোকেরা পর্দার ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে পারত না। এ নিয়ে সব সময় মা আর ভাইদের সাথে আমার তর্ক লেগেই থাকত। তারা আপত্তি করত, আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়েও কেন মাথা ঢেকে রাখি?

কেন পুরো শরীর-ঢাকা পোশাক পরি?

কেন আর সবার মতো করে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিশি না?

চুলটা কি একটু খোলা রাখা যায় না?

কতশত প্রশ্ন! আমিও চুপ করে থাকতাম না। পালটা যুক্তি দিতাম, 'আমি খোলা চুলে শরীর দেখিয়ে বাইরে যাই, আর বখাটেরা আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাক! তখন খুব ভালো লাগবে তোমাদের, তাই না? আত্মসম্মানবোধে একটুও ঘা লাগবে না? তোমরাই না আমার সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ হবে! অথচ তোমাদেরই উলটো হাল! সম্মানের সাথে শালীন পোশাকে বের হলে কেন কুণ্ঠাবোধ করো তোমরা?'

ভাইদের আত্মসম্মানে আঘাত দিতে চাইতাম এসব বলে। ধিক্কার দিতাম ভাতৃত্বের দোহাই দিয়ে। তবু তারা মানতে চাইত না। তাদের ভয়—এভাবে চললে আমার কোনো বিয়ের সম্বন্ধ আসবে না। এমন পর্দানশিন হিন্দু মেয়েকে কে বিয়ে করবে!

অবশ্য মা-ভাইদের আশঙ্কা সত্ত্বেও বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল! তখন পূজা দিতে মন্দিরে যেতাম নিয়মিত। এই যাতায়াতের সূত্র ধরেই প্রস্তাব আসে। বাবা-মা আর ভাইবোনদের বেশ মনঃপূত হয় সে প্রস্তাব। তারা সবাই 'হ্যাঁ' জানিয়ে দেয়। কেবল বাধ সেধেছিলাম আমি। বাবাকে বলেছিলাম, 'আমি এখনো অনেক ছোট। এ মুহূর্তে বিয়ে-সংসারের প্রতি মোটেও আগ্রহ নেই। বাবা, এই বিয়ের প্রস্তাবটা তুমি ফিরিয়ে দাও প্লিজ!'

বাবা আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। আদুরে মেয়ের অনুরোধ ফেলতে পারেননি তিনি। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে মা, আসলেই তুই অনেক ছোট। তুই যা বলবি, আমি তা-ই করব। কলেজে ভর্তি হয়ে নে। আমি এখনই ছেলেপক্ষকে 'না' করে দিচ্ছি।'

এই ঘটনার পর থেকে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। কেন যেন মনে হতো, আমার চারপাশটা একটা অদৃশ্য নিরাপত্তার বলয়ে ঘেরা। এই বলয় আমাকে বারে বারে ফিরিয়ে আনে মন্দকাজ থেকে।

বাবার অসন্তোষ

বাবার ব্যাবসায়িক পার্টনার ছিলেন মুসলিম। বাহ্যিকভাবে তাকে বেশ ধর্ম অনুরাগীই মনে হতো। আফসোস! অল্প কদিনের মাথায় বাবার সাথে ব্যাবসায়িক প্রতারণা করে বসেন তিনি।

একবার আমাদের ঘরের সমস্ত মালামাল চুরি হয়ে যায়। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হই আমরা। আশ্চর্যের বিষয়—কিছুদিন পর চুরি যাওয়া সব মালামাল দেখা গেল সেই লোকের কাছে। বিক্রি করবেন বলে গদিতে তুলেছেন। এ দৃশ্য দেখে বাবার মন ভেঙে যায়। গোটা মুসলিম জাতির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন তিনি। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, মুসলিমরা কখনোই সত্যবাদী হয় না। কোনো অবস্থায়ই কোনো মুসলিমের ওপর ভরসা করবেন না তিনি।

এই ঘটনার পর বাবা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে তার চিকিৎসা করা হয়। তার অসহায়ত্বের সেই দিনগুলোর কথা কখনোই ভুলব না আমি। তখন আমার দিনের বড় একটা অংশ কেটে যেত স্টোর রুমে। পূজার জন্য সেখানে একটা ছোট্ট মন্দির বানিয়েছিলাম। ভগবানের মূর্তি রাখা ছিল রুমের ঠিক মাঝখানটায়। ঘরের লোকজন ওই মূর্তিকে পূজা দিত প্রতিদিন। স্থানীয় বড় মন্দিরটা ছিল আমাদের ঘর থেকে বেশ দূরে। প্রতিদিন সেখানে গিয়ে পূজা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাই ঘরের লোকেরা যে যার সুযোগমতো এখানে এসে পূজা করে যেত। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ঘরোয়া চাপ ছিল না। আমাদের কাছে জীবনের অর্থ ছিল উপার্জন আর আহার-বিহার। আর ধর্ম ছিল পারিবারিক প্রথা মাত্র। স্টোর রুমে গিয়ে আমি ভগবানের মূর্তির কাছে বাবার সুস্থতা কামনা করতাম—আমার উপাসনা বলতে এতটুকুই।

অনুভূতির উৎস

মিরপুরখাসে আমাদের বাড়ির সাথে লাগোয়া বেশ কয়েকটা হিন্দু আত্মীয়-বাড়ি ছিল। আর গলির অপর পাশে ছিল মুসলিম পরিবারের বসবাস। আমরা মিলেমিশে থাকতাম। পরস্পরের মাঝে যাতায়াতও ছিল বেশ।

তবে সেখানে একটা পরিবার ছিল একটু আলাদা। দ্বীনদার পাঠান পরিবার। কঠোর পর্দা-পুশিদায় চলত তারা। এ জন্য তাদের বাড়িতে যাতায়াত কম হতো। বড়জোর দেখা-সাক্ষাতে কুশল বিনিময়। বাড়ির বয়স্ক মহিলাটিকে আমরা 'আন্টি' বলে ডাকতাম। আমাকে দেখলে খুবই খুশি হতেন তিনি।

সমবয়সি এক মুসলিম মেয়ের সাথেও বন্ধুত্ব ছিল আমার। সে আমাদের বাড়িতে আসত, আমিও যেতাম তাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়ির মালিক থাকতেন নিচতলায়। তিনিও বেশ ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। নিয়মিত তার সাথে কথাবার্তা হতো আমার।

বলা চলে আমাদের চারপাশটা মুসলিম পরিবার দিয়ে ঘেরা ছিল। তারপরও কী অদ্ভুত ব্যাপার—তাদের কেউ কোনোদিন আমাকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়নি। দীর্ঘ নয় বছর তাদের আশেপাশেই ছিলাম আমি। ভেবে অবাক হই, কী করে তারা দাওয়াত না দিয়ে থাকতে পারল এতগুলো বছর!

আমাদের আশেপাশে কখনো মুহাররমের জলসা হতো। কখনো মিলাদ হতো। কখনো আবার কুরআনের আসর। আমি খুব শখ করে এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম। মুসলিম মেয়েদের মতো মাথায় ওড়না দিয়ে চলাফেরা করতাম, ভালো লাগত ভীষণ। অবশ্য এ ভালো লাগার জন্য পরিবার আর ধর্মের বিরুদ্ধে যেতে হতো আমাকে।

একদিনের কথা। পাশের এক মুসলিম পরিবারে কুরআনের আসর হচ্ছিল। ওই পরিবারের সমবয়সি মেয়েটা আমার বান্ধবী। সেই সূত্র ধরে আমি তাদের বাসায় হাজির হই। সেখানে পরিচয় হয় আনআমের সাথে। প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় ওকে। উচ্ছল-প্রাণবন্ত একটা মেয়ে, যাকে দেখলেই মনে হয় একটু পরিচিত হই, একটু কথা বলি।

সেদিন বিদায়ের মুহূর্তে আমরা একে অপরকে নিজেদের বাসায় দাওয়াত দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'প্রথমে তুমি আমাদের বাসায় এসো। এরপর আমি তোমাদের বাসায় যাব।'

আনআমের কথা খুব মনে পড়ে। মেয়েটা খুবই ভালো। একেবারে কোমল স্বভাবের। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। ওর প্রতিটি কথায় ছিল পবিত্রতার ছোঁয়া। ইশ, ওর সাথে যদি আবার দেখা হতো!

আনআম আমার ঘরে

সকাল থেকে আদা-জল খেয়ে ঘর ধোয়ামোছার কাজ করছিলাম। কোনো উপলক্ষ্য ছিল না, মাঝে মাঝে ঘর গোছাতে বেশ লাগে। কাজ শেষে পুরো ঘরে চোখ বুলাতে কী যে অপার্থিব আনন্দ! এই আনন্দ অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। সব গুছিয়ে যখন ঘরের দিকে তাকালাম, মনে হচ্ছিল, প্রতিটি কোণে আলো ঝলমল করছে। ওদিকে আমার আকস্মিক 'শুদ্ধি-অভিযান' দেখে বাসার সবাই ধরে নিয়েছে কাউকে বুঝি আজ দাওয়াত করেছি।

এরই মধ্যে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। ভাবলাম, হয়তো কোনো আত্মীয় এসেছে, কিংবা বাবা। দ্রুত পায়ে ছুটে গেলাম দরজায়। দরজার ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখি হিজাব পরা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিজাব পরে আবার কে এলো এই অসময়ে? ছিটকিনিটা খুলে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কেমন আছ মনিকা?'

আরে! এ কণ্ঠ তো আমার চেনা! একে তো আমি চিনি! কবে থেকেই তার সাক্ষাতের অপেক্ষায়—

'আনআম নাকি!'

'হ্যাঁ, আমিই। আজ সত্যি সত্যিই চলে এলাম। কী বিশ্বাস হচ্ছে না? আরে, ঢুকতে দেবে না বুঝি? পথ থেকে সরে দাঁড়াবে তো!'

খানিক অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়ালাম আমি। ভাবতেই পারিনি এত দ্রুত আমার ইচ্ছে পূরণ হবে। ভেতরে নিজের রুমে বসালাম ওকে।

'এ কদিন একবারও ভেবেছিলে আমার কথা?'

'আর বোলো না, তুমি ভাবতেও পারবে না কতটা অবাক হয়েছি আমি! সেদিনও ভাবছিলাম, ইশ, তোমার সাথে যদি আবার দেখা হতো! আমার হাহাকার তো দেখছি তোমার কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছে গেছে!'

'মনিকা, সত্যি বলছি, তোমার হাহাকারই আজ আমাকে এখানে টেনে এনেছে। নইলে আজ আমার এখানে আসবার কথা ছিল না।'

প্রশ্নের মুখোমুখি

আমার সাজানো-গোছানো রুম আনআমের চোখে পড়েছে। বায়না ধরেছে—পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখবে। এই বায়নায় আমি খানিকটা আহ্লাদিতই হলাম। একটু আগেই যে ঘর-দুয়ার ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে-তকতকে করে রেখেছি! ওকে এখন একটা পরিষ্কার-পরিপাটি বাড়ি দেখাতে পারব। তাই কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ রুমের বাইরে নিয়ে এলাম ওকে। ঘুরে দেখাতে লাগলাম পুরো বাড়ি। একে একে সব রুম দেখিয়ে শেষে নিয়ে এলাম আমাদের ছোট্ট মন্দিরে—স্টোর রুমে। কে ভেবেছিল,

আনআমের বায়না হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে হেসে উঠবে আমার জীবনে!

স্টোর রুমের দুয়ারে পা রাখতেই আনআম বড় বড় চোখ করে মূর্তিগুলো দেখতে লাগল। এরপর একবার মূর্তির দিকে, আরেকবার আমার দিকে চোখ নিবন্ধ করে জিজ্ঞেস করল—

'মনিকা, এগুলো কী?'

'আমাদের ভগবান।'

'এখানকার সবগুলোই কি তোমাদের ভগবান?'

'হ্যাঁ, সবগুলোই।'

'তুমি কার উপাসনা করো?'

'কেন? আমার ভগবানদের।'

উত্তর শুনে আনআম যেন হোঁচট খেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—

'কেন? কী হয়েছে?'

'না, এমনি। তবে একটা প্রশ্ন, এই মূর্তিগুলো কি হাতের তৈরি?'

'হ্যাঁ, মাটি আর খড়ের তৈরি। বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।'

'সে তো বুঝলাম। এবার বলো, এগুলো কি কোনো মানুষের বানানো?'

'কী আশ্চর্য! হাতে তৈরি মূর্তি মানুষ ছাড়া আর কে বানাবে, বলো?'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, মূর্তিগুলো মানুষের হাতের তৈরি? তাহলে তো এসব একেবারেই পরনির্ভরশীল। মানুষ এগুলো মাটি আর খড় দিয়ে তৈরি করে। এরপরও তোমরা এসবের উপাসনা করো!'

আনআমের কণ্ঠে বিস্ময়। আমার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক নয়নে। যেন শুনতে চায়—কেন এই পরনির্ভরশীল মূর্তির উপাসনা করি। কথা বলার শক্তি পাচ্ছি না আমি। ওর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে চুপ থাকতে দেখে আনআম নিজেই বলতে শুরু করে, 'মনিকা, একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছ? মূর্তিগুলো নিজেরাই যখন মানুষের ওপর নির্ভরশীল, তখন কীভাবে এরা মানুষের উপকার করবে? কীভাবে মানুষের বিপদে সাহায্য করবে, প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে? কীভাবেই-বা দান

করবে দুহাত খুলে? আচ্ছা, তোমরা এগুলোর কাছে এ যাবৎ যা কিছু চেয়েছ, এরা কি কখনো দিতে পেরেছে সেসব?'

'অবশ্যই। আমরা তাদের কাছে চাইলে, তারা আমাদের দান করেন। বিপদে সাহায্য করেন।'

আনআম তখন ফিক করে হেসে বলল, 'যে মহান সত্তা আমাদের দান করেন, তিনি এইসব পরনির্ভরশীল বস্তু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি-আমি-সহ পুরো বিশ্বভূমণ্ডল সেই সত্তার মুখাপেক্ষী। এই মাটির তৈরি পরনির্ভরশীল বস্তুগুলো আমাদের কী আর দেবে!'

আনআম যখন কথাগুলো বলছিল, তার চোখে আমি আলোর ঝলকানি দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল আলোর স্রোত ওর চোখ থেকে আমার চোখ বেয়ে পুরো শরীরে বয়ে যাচ্ছে। সে আলোর পরশ অনুভব করতেই বুকের ভেতর তীব্র ধকধকানি শুরু হলো। একেবারে শূন্য মনে হতে লাগল মাথাটা। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলাম। ওকে সাথে করে বেরিয়ে এলাম স্টোর রুম থেকে।

গল্পে গল্পে একসময় আনআম বাসায় ফেরার কথা বলল। বিদায় জানাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। যাওয়ার সময় ও আরেকবার বলে গেল, 'মনিকা, আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখো। আল্লাহ হাফিয।'

আলোড়ন

আনআমকে বিদায় দিয়ে খাটের ওপর বসে পড়লাম। হাত-পা কাঁপছিল রীতিমতো। যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমার ওপর। জীবন নিয়ে হিসাব কষতে বসলাম, ঠিক যেমন ভূমিকম্পের শেষে মানুষ ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করে। কতটা দিন পেরিয়ে গেছে বেহিসাবে, বেখেয়ালে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক! আজ আনআম আমার হৃদয়-জমিন কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। কী করলাম এতটা দিন? কী পেয়েছি এই দিনগুলোতে? হারিয়েছিই-বা কী? এই মুহূর্তে আমার ঠিক কী করা দরকার? কেন নিরন্তর আমার হাত-পা কেঁপে চলেছে? কী হচ্ছে আমার সাথে?

সন্ধ্যায় যখন স্টোর রুমে এলাম, তখন নিজেকে অচেনা-অচেনা মনে হচ্ছিল। ভগবানের মূর্তিগুলো ছুঁয়ে দেখলাম—মাটির তৈরি নির্জীব মূর্তি। এতদিন এরই পূজো দিয়ে এসেছি। এগুলো যদি ভগবানই হয়ে থাকে, তাহলে কেন এরা আমাদের মুখাপেক্ষী?

বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি, মাটির মাঝে যে-সকল উপাদান রয়েছে, মানুষের মাঝেও ঠিক সেই উপাদানগুলো রয়েছে। তার মানে, আমি নিজেও মাটির তৈরি। তাহলে আমি কে? এরা কারা? প্রশ্নের ঝড় উঠেছে মনে—এগুলো কি আসলেই আমাদের ভগবান? আমরাই তো এগুলো মাটি দিয়ে তৈরি করেছি। আবার আমরাও মাটির তৈরি। সৃষ্টি আর স্রষ্টা কি একই উপাদানে গড়া হতে পারে? যদি না হয়, তবে আমাদের স্রষ্টা কে? কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

চিন্তা করেও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। প্রচণ্ড অসহায় আমি! কষ্টের তীব্রতা চোখ বেয়ে অশ্রু হয়ে ঝরছে। সে অশ্রুর ফোঁটাগুলো ভিজিয়ে দিল ভগবানদের—মাটির তৈরি মুখাপেক্ষী ভগবানদের। স্টোর রুমের সমস্ত ভগবান ক্রমশ ঝাপসা হতে শুরু করেছে। অশ্রুবারি পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে আমার চোখের সামনে।

বুঝতে পারছি না কিছুতেই—আমাদের পিতৃপুরুষ এই অসহায় ভগবানগুলোর উপাসনা করেছেন বলে আমাদেরও সেগুলোর উপাসনা করতে হবে? এভাবে না বুঝেই দিনের পর দিন তাদের অন্ধ অনুকরণ করে যেতে হবে? এগুলো নাকের ডগায় বসা একটা মাছিও তাড়াতে পারে না জেনেও!

আনআম আমার রুমে ফিরে এসে বলেছিল, 'মনিকা, বাইরে তাকিয়ে দেখো, কী সুন্দর প্রকৃতি। দিগন্ত-বিস্তৃত নীল আকাশ। রাতের আকাশে জ্বলজ্বলে বিশাল চাঁদ, শত শত নক্ষত্র। রহস্যভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো তো, এগুলো কি কোনো মূর্তির তৈরি? বিজ্ঞানের বইতে রহস্যময় সমুদ্র সম্পর্কে কত তথ্যই তো পড়েছি আমরা। তোমার কি মনে হয়, তোমার স্টোর রুমের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পড়ে থাকা ভগবানগুলো এই সমুদ্র আর মহাসমুদ্র সৃষ্টি করেছে? কথাগুলো ভেবে দেখো কিন্তু।'

সেই রাতে

শত চেষ্টা করেও দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। পেছনের জীবন নিয়ে মনের অলিন্দে হাজারো প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। দোটানায় পড়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করেই নির্ঘুম রাত কেটে যাচ্ছিল। জীবনে এই প্রথম নিজেকে মূল্যহীন মনে হচ্ছিল খুব।

রাতের শেষ প্রহরে হঠাৎ মনে হলো আমার সমস্ত অস্থিরতা কেটে যাচ্ছে। মনে হলো, এখন, এই মুহূর্তে আমার কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু ঠিক কী করা দরকার—তা জানি না। এখানে এই গভীর রাতে কে আমাকে বোঝাবে! কে আমাকে শেখাবে! কে আমাকে সঠিক পথ বাতলে দেবে!

বিছানা থেকে উঠে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। বাইরে অন্ধকার। সামান্য দূরে একশো ওয়াটের একটা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। সে বাতির আলোয় মসজিদের আবছা অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। বিমোহিত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মসজিদের দিকে। আগেও অনেকবার এমন হয়েছে। কিন্তু আজ কেন যেন আমার দৃষ্টি আটকে গেল মসজিদের আলোকিত মিনারে। কেমন যেন একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। মনে হলো, মসজিদের মিনার থেকে এক টুকরো আলো ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আচ্ছা, মিনারের এই আলো কি আমাকে কোনো কিছুর দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে? আগে কি কখনো দেখেছি এই আলো?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এলো 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। ফজরের আযান। পুরো শরীরে প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল যেন। এতক্ষণ যে অদৃশ্য বোঝার চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, মনে হলো, এখন সেই বোঝা হালকা হয়ে এসেছে। দেহ-মন একেবারে নির্ভার হয়ে গেছে। সর্বসত্তায় ফিরে এসেছে সতেজতা আর প্রাণোচ্ছলতা।

আযান শেষ হওয়ার পরও অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আনমনে। এরপর ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়, ছোট বোন নীলমের অবিরাম ডাকাডাকির পর। আজ যেন নিজেকে একটু বেশিই সতেজ মনে হচ্ছে।

এ মুহূর্তে আনআমের সাথে কথা বলা দরকার আমার। মোবাইল তুলে নিয়ে ফোন করলাম। ওপাশ থেকে আনআমই কথা বলা শুরু করল। যেন ও এতক্ষণ আমার ফোনের অপেক্ষায়ই ছিল।

'আস সালামু আলাইকুম। কে বলছেন?'

'ওয়া লাইকুমুস সালাম। আমি মনিকা।'

'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম, জানো?'

‘আনআম, তোমার কালকের কথাগুলো প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে আমাকে। এ বিষয়ে আরও জানতে চাই। আমার মনে হচ্ছে, আমি এত দিন এই কথাগুলোই শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।’

‘মনিকা, আমি কিন্তু কালকের কথাগুলো তোমাকে হুটহাট বলিনি। তোমার সাথে যেদিন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিনই অনুভব করেছিলাম, তোমার ভেতরে একটা অনুসন্ধিৎসু মন রয়েছে। সে তোমাকে অস্ফুট আওয়াজে বলতে চাইছে, আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে লক্ষ্যহীন করে পাঠাননি। তোমার এই অনুসন্ধানী মনই তোমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তোমাকে দিয়ে পৃথিবীতে কাজ করিয়ে নিতে চান। তবে কী কাজ, সেটা সময়ই বলে দেবে। অদৃশ্যের সংবাদ শুধু আল্লাহই জানেন। সব খবরাখবর শুধু তাঁর কাছেই থাকে। এ কারণেই আমি কাল তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, মূর্তির পায়ে মাথা ঠুকলে মূর্তিও ভেঙে যাবে, তোমার মাথাও আহত হবে; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। একটু ভেবে দেখো তো, আল্লাহ আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কেন দিয়েছেন? মন-মস্তিষ্ক কেন দান করেছেন? আল্লাহ কেন আমাদের জন্তু-জানোয়ারের মতো বিবেকহীন করে সৃষ্টি করেননি? কেন পশুদের সব অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন? কেন আমাদের পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের মাঝে ঝুলিয়ে রেখেছেন? আর কেনই-বা আমাদের পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন?’

এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছে আনআম। এ কথাগুলো ভাবার জন্যই আল্লাহ আমাদের মন-মস্তিষ্ক দিয়েছেন। যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। এরপরও কেন আমরা হাতের তৈরি মূর্তির পদতলে মাথা ঠুকব? আল্লাহ আমাদের দীর্ঘ অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। যারা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, তারা এই সুযোগ গ্রহণ করে ফিরে আসে তাঁরই দিকে। আর যারা শয়তানের অনুচর, তারা শয়তানের কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ শয়তানকেও লম্বা অবকাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তান সেই অবকাশ কাজে লাগায়নি। বরং কেউ যেন অবকাশ কাজে লাগাতে না পারে—সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুতরাং, শয়তানের ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে কাজে লাগাতে হবে আল্লাহর দেওয়া সমস্ত সুযোগ।’

জানি না, আনআম আমার সাথে কথা বলছিল, নাকি জীবনের সঞ্জীবনী সুধা পান করাচ্ছিল। এমন কথা আমি আগে কখনো শুনিনি। অথচ শোনার জন্য কী তৃষিতই-না ছিলাম!

ঘরের প্রতিটা সদস্যকে অচেনা লাগছিল সে-মুহূর্তে। আমি যেন সুমহান স্রষ্টাকে ছাড়া আর কাউকেই চিনি না! মন চাইছিল একান্তে আল্লাহর সাথে কথা বলি, তিনিই আমার সব, তিনিই আমায় পথ দেখাবেন।

পরের রাতে ঠিক শেষ প্রহরে ঘুম ভেঙে গেল আমার। বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম মসজিদের মিনারের দিকে। একসময় ফজরের আযান হলো। হৃদয়ভরা ভালোবাসা নিয়ে আযান শুনলাম। হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম প্রতিটি শব্দ।

মুসল্লিরা দলে দলে মসজিদে আসতে শুরু করেছে। ইমাম সাহেব সালাতে দীর্ঘক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আমি শুনে যাচ্ছি বিমোহিত হৃদয়ে। সালাত শেষে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সতেজ হৃদয়ে, হাসিমাখা মুখে তাসবিহ পড়তে পড়তে ঘরে ফিরছে। গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির জানান দিচ্ছে নতুন প্রভাতের। পাতায় পাতায় দোল খাচ্ছে নতুন দিনের আলো। আশেপাশের কোনো ঘর থেকে ভেসে আসছে কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর সুর। এর আগে কখনো এতটা নিবিষ্ট চিত্তে আযান শুনিনি, তিলাওয়াত শুনিনি। এতটা গভীর দৃষ্টিতে মসজিদ দেখিনি, মুসল্লি দেখিনি। দেখিনি সকালের প্রকৃতিও। অনুভূতির বন্ধ কপাটগুলো যেন খুলে যাচ্ছে একটা একটা করে।

সত্যের আহ্বান

তিলাওয়াতের ওই আওয়াজ যেন সারাদিন ধরে গুঞ্জরিত হতে লাগল আমার কানে। দুপুরে আনআমকে ফোন করে সারাদিনের অনুভূতির কথা জানালাম। আনআম ভীষণ খুশি হয়ে বলল—

'তোমাকে এখন আর 'মনিকা' নামে ডাকতে ভালো লাগে না। আল্লাহর লাখ লাখ শোকর, তিনি তোমার জন্য পুরস্কারের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। কাজেই দ্রুত হাত বাড়িয়ে দাও। অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করো। তোমার প্রতিটি কথা থেকে 'আহাদ আহাদ' ধ্বনি উঠে আসছে। মনিকা, তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও।'

সত্যি বলতে কি, আমারও তা-ই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করব? আমি যে কিছুই জানি না!

আনআম কথা দিল সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। কিছু ছোট ছোট বই আর শাইখ তারিক জামিল সাহেবের ক্যাসেট পাঠাবে কয়েকটা। শেষে খুব করে বলে

দিল, 'তুমি অবশ্যই বইগুলো পড়বে। ক্যাসেটগুলোও শুনবে। ভুল হয় না যেন!'

সেদিনই সন্ধ্যায় আমি বই আর ক্যাসেটগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। এরপর শুরু হলো রাতের অপেক্ষা। পরিবারের লোকেরা কিছুতেই এসব মেনে নেবে না। তাই যা করতে হবে, সব লোকচক্ষুর আড়ালে।

আনআম আমাকে যে বইগুলো দিয়েছিল, সেগুলো দিনের বেলায় খোলার সাহস পাইনি। অন্ধকার নামতেই বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখলাম। অনেকগুলো বই— তা'লিমুল ইসলাম, আনওয়ারে হিদায়াত, ওযু-গোসলের মাসআলা ও বিধি-বিধান, ইসলামের পাঁচ রোকন, শিরক-বিদআত।

কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি তখন। পড়ালেখায় বেশ ভালো ছিলাম। শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুব পছন্দ করতেন আমাকে। বাসাতেও আমার পড়ালেখা নিয়ে কারও অভিযোগ ছিল না। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিলাম। রাতের বেলা আনআমের দেওয়া বইগুলো মেডিকেল কোর্সের বইপত্রের ভেতরে লুকিয়ে পড়তাম। ঘরের লোকজন যখন দেখত আমি রাত জেগে পড়াশোনা করছি, তখন খুশিই হতো। ভাবত মেয়েটা মেডিকেলের জন্য সাধ্যাতীত পরিশ্রম করছে!

বাবা ও বড় ভাইয়ারা পনেরো দিন পরপর বাড়িতে আসতেন। ফলে আমি দ্বীনি বইগুলো নিশ্চিন্তে পড়ার সুযোগ পেতাম। খেয়াল করে দেখেছি, যখনই দ্বীনি বই পড়ি, তখনই আমার মানসিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

হজের দিনে

জীবনে প্রথম বারের মতো শাইখ তারিক জামিলের বয়ান শুনলাম। চোখের পলকে কেটে গেল সারা রাত। অসহায় বান্দির অস্থিরতা দূর করতেই যেন আল্লাহ দ্রুত সকাল এনে দিলেন। পূব আকাশে সূর্যের কিরণ ফুটে ওঠামাত্র বিছানা ত্যাগ করলাম আমি। স্নান সেরে নাশতা করলাম বোনের সাথে। মা সাধারণত আমাদের আগেই নাশতা করে নেন। আজও ব্যতিক্রম হয়নি। ঘরের কিছু প্রয়োজনীয় কাজে সাহায্য করলাম তাকে। সব কাজ শেষে প্রশান্ত মনে আনআমকে ফোন দিলাম।

'আস সালামু আলাইকুম। আনআম, আমি আমি...' আজ প্রথম বারের মতো আমার নিজের নাম নিতে সংকোচ হচ্ছিল। মনিকা নামে নিজেকে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করছিল না আর।

‘ওয়া লাইকুমুস সালাম। কী হলো! শুধু ‘আমি আমি’ করছ কেন? আমি তো জানি, তুমি তুমি...।’ আনআমও আমার নাম ভুলে গেল ক্ষণিকের জন্য। ইতস্তত করে বলল, ‘এ কী হলো! তোমার নাম কেন মনে পড়ছে না? যা-ই হোক, আজ তো তোমাকে ঈদের জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। আমার বাপু ম্যালা কাজ!’

‘হ্যাঁ। আজ তোমাদের মতো আমার কোনো দৌড়ঝাঁপ নেই। তবে এর মধ্যে কি একটু সময় বের করতে পারবে? আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। একটু পরেই বাবা আর ভাইয়ারা চলে আসবেন। তাই এখন না। রাতে ফ্রি আছ?’

‘উমম...চেষ্টা করব। আজ কিন্তু আমাদের হজের দিন।’

‘ও আচ্ছা, ভালো হলো। তাহলে তুমি আজ আমার জন্য দুআ করো, আল্লাহ যেন আমাকে হজ করার সৌভাগ্য দান করেন। আল্লাহ হাফিয।’

‘অবশ্যই। আস সালামু আলাইকুম।’

ফোনটা রেখে রান্নাঘরে চলে গেলাম। বাবার জন্য রান্না করব আজ। আমরা ছোট তিন ভাই-বোন বাবার খুব আদরের। বাবা বাসায় এলে আমরা তার জন্য পছন্দের রান্না করি। তার কাপড়চোপড়, ওষুধপত্র এগিয়ে দিই। শরীর-স্বাস্থ্যের যত্ন নিই। খুব খুশি হন বাবা। তার শৈশব কেটেছে অনাদরে, অবহেলায়। মা-বাবাকে হারিয়েছেন খুব ছোটবেলায়। কখনো বোনদের আশ্রয়ে; আবার কখনো বড় ভাইদের দয়া আর করুণায় তার বেড়ে ওঠা। তারা কিছু দিলে খেতেন। নয়তো উপোস থাকতেন সারাবেলা। তারা যতটুকু পড়িয়েছেন, ততটুকুই পড়তে পেরেছেন।

প্রাপ্ত বয়সে এসে তার মনে হলো, এবার নিজে থেকে কিছু করা দরকার। নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। এই অনুভূতি থেকেই গায়ে-গতরে খাটতে শুরু করেন তিনি। একপর্যায়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষমও হন। ওদিকে হিন্দু ঘরানারই আরেক বংশে আমাদের মাতুলালয়। তারা যখন দেখল, ছেলের একক উপার্জনে ভাগ বসানোর মতো কেউ নেই, তখন সুযোগ বুঝে ছেলের হাতে তাদের পরিবারের এক মেয়েকে গছিয়ে দিল। মেয়ের পরিবারের চলন-বলন ও সংস্কৃতি কেমন, সেটা আর কেউ পরখ করে দেখার গরজ করেননি। ফলে অনেক কিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। তারপরও এখন যেহেতু তিনি আমার মা, আর তার পদতলেই আমার জান্নাত; তাই তার ব্যাপারে বেশি কিছু না বলাই সমীচীন আমার জন্য। শুধু এতটুকু বলি, সংসারের

ঘোর-প্যাঁচ আর অশান্তি থেকে বাঁচতে বাবা আমাদের ছোট তিন-ভাইবোনকে আগলে রেখেছিলেন। তখন কি তিনি জানতেন, তার আদরের মেয়ে দুটো তাকে কত বড় আঘাত দিতে চলেছে!

মনিকা থেকে আয়িশা

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে গল্প হচ্ছিল বাবার সাথে। বিছানায় বসে তার পা টিপে দিচ্ছিলাম আর গল্প করছিলাম। একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন বাবা। আমিও চলে এলাম নিজের রুমে। ওযু করলাম। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম নিজের জন্য। এরপর ফোন হাতে নিয়ে আনআমকে কল করলাম—

'আস সালামু আলাইকুম। কে বলছেন?'

'ওয়া লাইকুমুস সালাম। বুঝে নিন, কে হতে পারে!'

'সুযোগ পেলে তাহলে! তোমার বাবা, ভাইয়ারা এসে পড়েছেন বলে আমি আর ফোন করতে পারিনি!'

'ভালোই করেছ। যাই হোক, আমি এখন যা বলছি, তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। সম্ভবত এই মুহূর্তের পর তুমি আর 'মনিকা' নামের কাউকে পাবে না।'

'কেন? কী হয়েছে? এমন কথা বলছ কেন? কোথায় চলে যাবে তুমি?'

'ওই আকাশেরও ঊর্ধ্বে চলে যাব। বেরিয়ে পড়ব অনিঃশেষ আলোর উদ্দেশে।'

'আহ-হা! কী হেঁয়ালি শুরু করলে!'

'আনআম, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাচ্ছি। প্লিজ, আমাকে সাহায্য করো।'

'আল-হামদু লিল্লাহ। মুবারক হোক। আজ সন্ধ্যা থেকেই কিন্তু শুরু হয়ে গেছে পবিত্র ঈদুল আযহা। ঈদ মুবারক বন্ধু।'

'শুকরিয়া। আমার পরকাল সাজিয়ে তোলা বোনটিকেও অনেক অনেক মুবারকবাদ। শোনো, আমি গতকাল থেকেই বারবার কালিমা পড়ে চলেছি। এরপরও চাচ্ছি, তুমি আমাকে কালিমা পড়িয়ে দাও।'

আনআম আমাকে বিসমিল্লাহ পড়িয়ে প্রথমে 'কালিমায়ে তাওহিদ' আর 'কালিমায়ে শাহাদাত' পাঠ করাল। এরপর কালিমা দুটির অর্থ বলল। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও করে শোনাল। ব্যাখ্যা শেষে আবারও কালিমা দুটি পড়িয়ে দিল আমাকে। এবার নাম বদলের পালা। বেশ কিছু নাম থেকে 'আয়িশা' নামটা বেছে নিলাম আমি। এভাবেই আমি মনিকা থেকে আয়িশা হয়ে উঠলাম। আল-হামদু লিল্লাহ। আমাকে দ্বিতীয় বারের মতো মুবারকবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল আনআম।

আনন্দের আতিশয্যে আমি যেন মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। জীবনে প্রথম বারের মতো এতটা আনন্দিত হলাম যে, মনে হতে লাগল, কেউ আমার অসাড় দেহে নতুন করে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছে। অনিঃশেষ চঞ্চলতা এনে দিয়েছে মনের গহীনে। ফোন রেখেই মেহেদি লাগালাম হাতে-পায়ে। আমার 'ঈদ' যে শুরু হয়ে গেছে!

মেহেদি রাঙা হাতে কখন যে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, মনে নেই। ওই সময় বারবার মনে পড়ছিল আল্লাহর সাথে মুসা আলাইহিস সালামের কথোপকথনের ঘটনা। আল্লাহর সাথে তিনি কীভাবে কথা বলেছেন, সেই দৃশ্য কল্পনা করছিলাম চোখ বন্ধ করে। আর মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, 'হে আল্লাহ, আমাকেও সেই সৌভাগ্য দান করো। হে আল্লাহ, আমি জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে তোমার অভিমুখে রওনা করেছি। এ পথে অবিচল থাকার দৃঢ় প্রত্যয় দাও আমায়। যত পরীক্ষাই আসুক, আমাকে অবিচল থাকার তাওফিক দাও। হে মালিক, আমি জানি না, পরীক্ষার মুহূর্তগুলো কত দূরে; কিন্তু তুমি তো জানো। সুতরাং, তুমিই আমাকে রক্ষা করো। ও আল্লাহ, আমি আত্মভোলা দুর্বল বান্দি তোমার। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

প্রথম স্বপ্ন

কতক্ষণ এভাবে প্রার্থনা করছিলাম মনে নেই। প্রার্থনার মধ্যেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে স্বপ্নে দেখি—তীব্র আলো ঠিকরে পড়ছে আমার ওপর। সেই আলোয় ভর করে আমি ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছি। উঠছি তো উঠছিই। একপর্যায়ে চন্দ্র ও নক্ষত্রের স্তর ছাড়িয়ে আমি আরও ওপরে উঠে গেলাম। চন্দ্র ও নক্ষত্রও তখন আমার সাথে ওপরে উঠতে থাকে। একসময় দেখি আলোর বেষ্টনীতে সুরক্ষিত একটা আসন। আসনটিতে আমি বসলাম; মনে হলো যেন জান্নাতে বসে আছি।

এর পরপরই ঘুম ভেঙে গেল। তাহাজ্জুদের সময়। মহান আল্লাহ যেন চাইছেন আমি উঠে পড়ি। স্বপ্নটা দেখে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি জন্ম থেকেই মুসলিম। আর এই স্বপ্নের মাধ্যমে প্রিয় আল্লাহ আমার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন; আমাকে সাহায্য আর পুরস্কারের আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন।

বিছানা থেকে উঠে নিজের মতো করে ওযু করে নিলাম। চাদর বিছিয়ে বসে পড়লাম মেঝেতে। তখনো আমার দুচোখের গভীরে স্বপ্নের দৃশ্যগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। সালাত পড়ার নিয়ম জানি না। এ জন্য বসে বসে আল্লাহর কাছে অবিচলতা আর পোক্ত ঈমানের দুআ করলাম। দুআর মাঝে বুঁদ হয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ। চাদর ভিজে একাকার হয়ে গেল চোখের জলে। এমন এক ঘোর-লাগা আবেশে হারিয়ে গেলাম যে, মনে হচ্ছিল বিরান এক ভূমিতে আমি একা পড়ে আছি। আল্লাহ ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই।

একটু পরে মসজিদ থেকে ফজরের আযান ভেসে এলো। পূর্ণ মনোযোগের সাথে আযানের শব্দগুলো শুনলাম। হৃদয় ভরে উঠল প্রশান্তিতে। খানিক বাদেই ঈদের সালাত। আজই আমার জীবনের প্রথম ঈদ।

দ্বীনের প্রথম দাওয়াত

আমি বেশ যত্নের সাথে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। ছোট বোন নীলমকে বললাম, 'আজ আমার জীবনের প্রথম ঈদ। এখন থেকে আমার নাম আয়িশা।'

ও ভেবেছিল আমি ওর সাথে মজা করছি। তাই বলল, 'গপ্পো করার আর সময় পেলে না!'

আমি বললাম, 'দেখ, আমি তোকে সত্যি কথাই বলছি। আমি মুসলিম হয়ে গেছি। আমি যা করেছি, দীর্ঘ সময় ভেবে-চিন্তেই করেছি। তুই শুধু আমার জন্য একটা কাজ কর। আমার এ পরিবর্তনের কথা কাউকে বলবি না। এখনো বলার সময় হয়নি।'

'কী আবোল-তাবোল বকছ দিদি? তুমি কখন মুসলিম হলে? এখন তোমার কী হবে?'

'তুই মুখ বন্ধ রাখতে পারলে কিছুই হবে না, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমার সাথে আছেন।'

নীলমের বিস্ময় কাটছিল না। কী ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছিল না আসলে। খোলাসা করে সব জানালাম ওকে। ইসলাম সম্পর্কেও অনেক কিছু বললাম। নীলম তখন বলল, 'সব ঠিক আছে; কিন্তু এখন তোমার কী হবে?'

'যদি আবেগ ও নিয়ত ঠিক থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। ইসলাম সত্য ধর্ম। আমাদের পরকাল নষ্ট করা ঠিক হবে না রে, নীলম। আমি তোকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। তুইও ইসলাম গ্রহণ করে নে। মুসলিম হয়ে যা প্লিজ। এতেই আমাদের জন্য কল্যাণ। পরকালের শাস্তি খুব মারাত্মক নীলম, খুবই মারাত্মক। এই বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। আল্লাহ যদি তাদের সঠিক পথের দিশা না দেখায়? তখন কী হবে? আমি ভাবতেও পারি না! নীলম, তুই যদি ইসলাম গ্রহণ করিস, তাহলে আমি মনে করব, আল্লাহ তোকেও কবুল করেছেন। আমরা দুজন মিলে একসঙ্গে বাবা-মা আর ভাই-বোনদের ইসলামের দাওয়াত দেবো। ইন শা আল্লাহ, আমাদের পুরো পরিবার একদিন ইসলাম গ্রহণ করবে।'

আমার কথার উত্তরে নীলম কিছুই বলল না। নির্বাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বুঝলাম বেশি তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। ওর সময়ের প্রয়োজন। আল্লাহ চাইলে একদিন নীলমও সত্যের খোঁজ পাবে।

তখন থেকে আমি ধীরে ধীরে ওকে আনআমের দেওয়া বইগুলো পড়ে শোনানো শুরু করলাম। শাইখ তারিক জামিল সাহেবের সেই ক্যাসেটগুলোও শোনাতে লাগলাম। একরাতের ঘটনা। গভীর রাতে কানে হেডফোন লাগিয়ে শাইখের বয়ান শুনছিলাম আমরা। হুট করে বাবা চলে এলেন ঘরে। আমাদের কানে হেডফোন দেখে বললেন, 'কী হচ্ছে? গান শুনছ বুঝি!'

আমরা ততক্ষণে ঘাবড়ে গেছি। এটা-সেটা বলে পাশ কাটানোর চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু শব্দগুলো মুখে আটকে যাচ্ছিল বারবার।

আমাদের জড়তা দেখে বাবা বললেন, 'আমি তো এমনিতেই বলেছি। কিছুই হয়নি। তোরা খামাখা ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? এখন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। রাত জাগলে মাথা ব্যথা করে।'

বাবা চলে গেলেন। আমরাও যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। শাইখ তারিক জামিলের ক্যাসেট শুনলে আমার চোখে পানি চলে আসত। ভাবতাম, মানুষের কী হলো! তারা

কি শাইখের বয়ান শোনে না? তার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করে না?

নীলমকে ক্যাসেটগুলো শোনানোর পর বলতাম, 'দেখ, আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন আর আমরা কী করছি!'

নীলম মনোযোগের সাথেই শুনত; কিন্তু কিছু বলত না। আসলে ও কথাগুলো ঠিকই বুঝত; কিন্তু মাত্র পনেরো বছরের একটা মেয়ের পক্ষে আর কতটুকুই-বা দুঃসাহস দেখানো সম্ভব! ভয় আর অজানা আতঙ্ক তাকে ভাবতে বাধ্য করত। তবে এটাও সত্য—ও খেলাধুলার বলয় থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসেছিল। ঘরের কনিষ্ঠ সদস্য হওয়ার কারণে একদিকে যেমন সবার আদরের ভাগীদার ছিল; অন্যদিকে বাড়ির বড়দের চোট-ধমকও ওর জন্যই বরাদ্দ ছিল। খেলাধুলাপ্রিয়, খাবারদাবারে বায়না-করা এক কম বয়সি মেয়ের পক্ষে হঠাৎ এত বড় পদক্ষেপ নেওয়াটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আমার আর নীলমের পরিস্থিতি এক নয়। ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি অনুরাগ ছিল আমার। নিজেকে সবসময় শালীনতার চাদরে আবৃত করে রাখতে ভালোবাসতাম। মাথায় ওড়না দিয়ে স্কুলে যেতাম, কেউ কেউ ভাবত আমি বুঝি মুসলিমই।

স্কুলের ইসলামিয়াতের বইগুলো পড়তে বেশ ভালো লাগত। কোনো সহপাঠী হামদ পরিবেশন করলে তন্ময় হয়ে শুনতাম। কখনো কখনো আমার নিজেরও না'ত গাওয়ার শখ জাগত। একবার আমাদের স্কুলে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমার খুব করে মন চাইছিল সেখানে না'ত পরিবেশন করব। আয়োজকদের আমার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম। তারা আমার নিষ্পাপ ইচ্ছেটাকে একদমই গুরুত্ব দেননি। তার ওপর স্কুলের একজন মুসলিম শিক্ষক হিন্দুদের খুবই অপছন্দ করতেন। আমার কথা শুনেই মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি তো হিন্দু! তুমি কেন না'ত গাইবে?'

কী পরিমাণ কষ্ট যে আমি পেয়েছিলাম সেদিন—বলে বোঝাতে পারব না। হিন্দু বন্ধুরা আমাকে বিমর্ষ দেখে সান্ত্বনা দিয়েছিল অবশ্য। বলেছিল, 'শিক্ষকরাই যদি না'ত গাইতে না দেন, তাহলে আমরা কেন গাইতে যাব। যা হয়েছে ভুলে যাও। মুসলিমরা এমনই।'